'তাজাল্লিয়াতে নুবুওয়াত' গ্রন্থের অনুবাদ

রাসূলে আরাবি ﷺ

লেখক

সফিউর রহমান মুবারকপুরি رحمه الله

অনুবাদ

আশিক আরমান নিলয়

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

লেখকের কথা ১৮

প্রথম অধ্যায়:
মুহাম্মাদ ﷺ-এর বেড়ে ওঠা, বংশ-পরিচয় ও নুবুওয়াতের পুর্বের ঘটনাগুলো

- মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদি পুরুষগণ ২১
- নবিজি ﷺ-এর গোত্র ২১
- বংশধারা ২২
- জন্ম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর ২৬
- মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধপান ২৭
- হালীমা সা'দিয়ার কোলে নবিজি ২৭
- হালীমার ঘরে বরকতের বারিধারা ২৮
- শিশু মুহাম্মাদকে বুকে রাখতে হালীমার ব্যাকুলতা ২৯
- বক্ষবিদারণ: অলৌকিক ঘটনা ২৯
- মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন ৩০
- পিতামহের স্নেহ-ছায়ায় ৩০
- চাচার মমতাময় প্রতিপালন ৩১
- সিরিয়া সফর ও পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ ৩১
- ফিজার যুদ্ধ ৩২
- হিলফুল ফুদূল ৩৩

■ নবিজির কর্মজীবন ৩৩
■ সিরিয়ায় ব্যবসা-যাত্রা ৩৪
■ খাদীজার সাথে বিবাহ ৩৫
■ খাদীজা থেকে নবিজি ﷺ-এর সন্তানাদি ৩৫
■ বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ ও কালো পাথর ঘিরে বিবাদ নিরসন ৩৬
■ নুবুওয়াত লাভের পূর্বে নবি ﷺ-এর গুণাবলি ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়:
নুবুওয়াত-প্রাপ্তি, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ও আপতিত নিপীড়ন-নির্যাতন

■ নুবুওয়াত ও সৌভাগ্যের নিদর্শন ৪০
■ নুবুওয়াতের সূচনা ও ওহির অবতরণ ৪০
■ নুবুওয়াত ও ওহি সূচনার তারিখ ৪২
■ ওহি-বিরতি ও পুনরাবৃত্তি ৪৩
■ শুরু হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান ৪৪
■ সর্বপ্রথম ঈমান আনলেন যাঁরা ৪৬
■ ঈমানদারদের ইবাদাত ও প্রশিক্ষণ ৪৮
■ ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারণা ৫০
◆ আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ৫০
◆ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় ৫১
◆ হাজীদের ভুল বোঝাতে কুরাইশদের বৈঠক ৫৫
■ দমন-ষড়যন্ত্রের নানান রূপ ৫৭
◆ সামনা-সামনি হাসি-ঠাট্টা ও অপমান-অপদস্থ ৫৭
◆ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাক্য শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানো ৫৯
◆ সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা ও অপপ্রচার চালানো ৬০
◆ ইসলাম নিয়ে মুশরিকদের আপত্তি উত্থাপন ৬২

■ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ৭৬
◆ নির্যাতন-নিপীড়নের কিছু নমুনা ৭৬
◆ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুশরিকদের আচরণ ৮২
◆ আবূ তালিবের সাথে কুরাইশদের কথোপকথন ৮২
◆ আবূ তালিবকে কুরাইশদের হুমকি ও চ্যালেঞ্জ ৮২
◆ কুরাইশদের অদ্ভুত প্রস্তাব ও তার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান ৮৩
■ নবিজি ﷺ-এর ওপর নির্যাতন ৮৪
◆ মুসলিমদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র—দারুল আরকাম ৮৯
◆ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত (রজব, নুবুওয়াতের ৫ম বছর) ৯০
◆ মুসলিম-মুশরিক লুটিয়ে পড়ে সাজদায় অদৃশ্যের ইশারায় ৯১
◆ মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ৯১
◆ আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত ৯২
◆ মুসলমানদের ফেরাতে কুরাইশদের অপতৎপরতা ৯২
◆ দেশে-বিদেশে পরাজিত মুশরিকপক্ষের পেরেশানি ৯৫
◆ নবিজি ﷺ-এর প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি ও হত্যার প্রচেষ্টা ৯৫
◆ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ ৯৯
◆ উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ ১০০
◆ উমর رضي الله عنه-এর ইসলাম গ্রহণে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ১০৩
◆ উমর رضي الله عنه-এর কারণে মুসলমান ও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ১০৫
◆ লোভনীয় প্রস্তাব ১০৫
◆ সমঝোতার চেষ্টা ১০৮
◆ শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া ১১২
◆ পূর্ণ বয়কট ১১৪
◆ চুক্তিপত্রের বিনাশ ও বয়কটের সমাপ্তি ১১৫
◆ আবূ তালিবের কাছে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ১১৬

■ দুঃখবর্ষ ১১৭
◆ আবূ তালিবের মৃত্যু ১১৮
◆ খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যু ১১৯
◆ দুঃখের ওপরে দুঃখ ১২০
◆ সাওদা ও আয়িশার সাথে নবিজির বিবাহ ১২০
■ নবিজি ﷺ-এর তায়িফ গমন ১২১
■ মুশরিকদের মু'জিযা-অলৌকিক কিছু দেখানোর দাবি ১২৫
◆ টুকরো হলো চাঁদ ১২৮
◆ ঊর্ধ্বাকাশে রাত্রিভ্রমণ—ইসরা ও মি'রাজ ১২৯
■ গোত্রে গোত্রে ইসলামের দাওয়াত ১৩২
■ মক্কার বাইরে ছড়ানো ঈমানের বীজ ১৩৩
◆ সুওয়াইদ ইবনু সামিত ১৩৩
◆ ইয়াস ইবনু মুআয ১৩৪
◆ আবূ যার গিফারি ১৩৪
◆ তুফাইল ইবনু আমর দাউসি ১৩৪
◆ দিমাদ আযদি ১৩৫

তৃতীয় অধ্যায়: মদীনায় হিজরত

■ মদীনায় ইসলামের হাওয়া ১৩৮
■ আকাবার প্রথম বাইআত ১৩৯
■ ইয়াসরিবে ইসলামের দাওয়াত ১৪০
■ আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ১৪১
◆ বারো নেতা ১৪৪
■ মুসলমানদের মদীনায় হিজরত ১৪৬
■ দারুন নাদওয়ায় বৈঠকে কুরাইশ ১৪৭

■ নবি ﷺ-এর হিজরত ১৪৯
◆ কুরাইশদের সলা-পরামর্শ আর আল্লাহর কুদরতি পরিকল্পনা ১৪৯
◆ নবিজি ﷺ গৃহত্যাগ করলেন যখন ১৫০
◆ গুহায় তিন রাত ১৫১
◆ মদীনার পথে ১৫২
◆ কুবায় আগমন ১৫৫
◆ নবিজি ﷺ-এর মদীনা প্রবেশ ১৫৬
◆ আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হিজরত ১৫৭
◆ নবি-পরিবারের হিজরত ১৫৭
◆ সুহাইব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হিজরত ১৫৮
◆ মক্কায় দুর্বল মুসলিমগণ ১৫৮
◆ মদীনার আবহাওয়া ১৫৮
■ মদীনার জীবনে নবি ﷺ-এর কর্মধারা ১৫৯
◆ মাসজিদে নববি ১৫৯
◆ আযান ১৬০
◆ আনসার-মুহাজির ভাই-ভাই ১৬১
◆ ইসলামি সমাজ ১৬২

চতুর্থ অধ্যায়: সামরিক অভিযান (গযওয়া ও সারিয়্যা)

■ উদীয়মান হুমকি ১৬৭
■ লড়াইয়ের অনুমতি ১৬৮
■ যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ ১৬৯
◆ নতুন কিবলা ১৭১
◆ বদরের যুদ্ধ (১৭ রমাদান, ২য় হিজরি) ১৭১
• দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান ১৭৬
• শুরু হলো যুদ্ধ ১৭৬
• আবূ জাহলের নরকযাত্রা ১৭৮

• পার্থক্য গড়ে দেওয়ার সেই দিন ১৭৯
• দুই পক্ষের নিহত ব্যক্তিগণ ১৮০
• দিকে দিকে যুদ্ধজয়ের খবর ১৮০
• মদীনায় প্রত্যাবর্তন ১৮১
• বন্দিদলের মুক্তিপণ ১৮২
• দুই প্রদীপের ধারক ১৮২

◆ বদর-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ১৮৩
• বানূ সুলাইমের যুদ্ধ ১৮৩
• নবি ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা ১৮৩
• বানূ কাইনুকার যুদ্ধ ১৮৪
• সাওয়ীকের যুদ্ধ ১৮৪
• কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা ১৮৫
• কারদাহ অভিযান ১৮৭

◆ উহুদের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি) ১৮৭
• দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লড়াইয়ের শুরু ১৯০
• নবিজির ওপর মুশরিকদের আক্রমণ ও নবিপ্রয়াণের গুজব ... ১৯১
• মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ১৯৪
• পর্বতগিরিতে আশ্রয় ১৯৫
• বাগ্‌বিতণ্ডা ও যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ১৯৬
• মুশরিকদের মক্কায় ফেরা ১৯৮
• মুসলিম বাহিনী মদীনা অভিমুখী ১৯৯
• হামরাউল আসাদের যুদ্ধ ১৯৯

◆ উহুদ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও যুদ্ধসমূহ ২০১
• শোকাবহ রজী' ২০১
• মর্মান্তিক বি'রু মাউনা ২০৩
• বানূ নাদীরের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরি) ২০৪

• বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ (শা'বান, ৪র্থ হিজরি) ২০৭

◆ খন্দকের যুদ্ধ (শাওয়াল ও যুল-কা'দা, ৫ম হিজরি) ২০৮

• খন্দক বা পরিখা খনন ২০৮

• পরিখার ওপারে ২১০

• বানূ কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ২১৩

• কাফিরদের বন্ধুত্বে ফাটল ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ২১৪

◆ বানূ কুরাইযার যুদ্ধ (যুল-কা'দা, ৫ম হিজরি) ২১৭

• আবূ রাফি'র হত্যাকাণ্ড (যুল-হিজ্জাহ, ৫ম হিজরি) ২২১

• ইয়ামামার নেতা
সুমামা ইবনু উসালের বন্দি (মুহাররম, ৬ষ্ঠ হিজরি) ২২৩

• বানূ লিহইয়ানের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ৬ষ্ঠ হিজরি) ২২৪

• যাইনাব ﵂-এর স্বামী আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ ২২৪

◆ বানুল মুস্‌তালিকের যুদ্ধ (শা'বান, ৬ষ্ঠ হিজরি) ২২৫

• আনসার-মুহাজির দ্বন্দ্ব ২২৬

• আয়িশা ﵂-এর প্রতি অপবাদ ২২৮

◆ হুদায়বিয়ার উমরা (যুল-কা'দা, ৬ষ্ঠ হিজরি) ২৩৩

• উমরা-যাত্রা এবং হুদাইবিয়ায় যাত্রাবিরতি ২৩৩

• রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরাইশদের মাঝে আলোচনা ২৩৫

• উসমান ﵁-এর বার্তাবহন এবং বাইআতুর রিদওয়ান ২৩৭

• হুদাইবিয়ার সন্ধি ২৩৯

• আবূ জান্‌দালের ঈমানজাগানিয়া ঘটনা ২৪০

• সন্ধি নিয়ে অসন্তোষ ২৪০

• মুহাজির নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ২৪৩

• মুসলমানদের চুক্তিতে বানূ খুযাআ ২৪৪

• আবূ বাসীর ﵁-এর ঘটনা ও
মক্কার দুর্বল মুসলিমদের মুক্তি ২৪৪

• সন্ধি-চুক্তির প্রভাব ২৪৫

◆ রাজা-বাদশা ও প্রশাসকদের প্রতি নবিজি ﷺ-এর চিঠিপত্র ২৪৬

• আবিসিনিয়ার রাজা আসহামার প্রতি চিঠি ২৪৬

• আলেকজান্দ্রিয়া ও মিসরের সম্রাট মুকাওকিসের প্রতি চিঠি ২৪৭

• পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের প্রতি চিঠি ২৪৮

• রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি চিঠি ২৪৯

• হারিস ইবনু আবী শিম্‌র গাসসানির প্রতি চিঠি ২৫৩

• বুসরার আমীরের প্রতি চিঠি ২৫৪

• ইয়ামামা-অধিপতি হাওযা ইবনু আলির প্রতি চিঠি ২৫৪

• বাহরাইনের প্রশাসক মুনযির ইবনু সাওয়ার প্রতি চিঠি ২৫৫

• ওমানের শাসক জাইফার ও তার ভাইয়ের প্রতি চিঠি ২৫৫

◆ যী কারাদ বা গাবার যুদ্ধ (মুহাররম, ৭ম হিজরি) ২৫৭

◆ খাইবার বিজয় (মুহাররম, ৭ম হিজরি) ২৫৯

• নাতাহ এলাকার বিজয় ২৬০

• শাক এলাকার বিজয় ২৬৩

• কাতিবাহ এলাকার বিজয় ২৬৪

• আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ও
আবূ হুরায়রা ﷺ-এর আগমন ২৬৫

• খাইবারের গনীমাত বণ্টন ২৬৫

• নবিজি ﷺ-কে বিষপ্রয়োগ ২৬৬

• ফাদাকবাসীর আত্মসমর্পণ ২৬৭

• ওয়াদিল কুরা ২৬৭

• তাইমাবাসীদের সাথে বোঝাপড়া ২৬৮

• সফিয়্যার সাথে নবিজির পরিণয় ২৬৮

◆ যাতুর রিকা'র যুদ্ধ (জুমাদাল উলা, ৭ম হিজরি) ২৬৯

• আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে?! ২৬৯

◆ কাযা উমরা পালন (যুল-কা'দা, ৭ম হিজরি) ২৭০

◆ মূতা অভিযান (জুমাদাল উলা, ৮ম হিজরি) ২৭৩
◆ যাতুস সালাসিলের অভিযান (জুমাদাল আখিরাহ, ৮ম হিজরি) ২৭৫
◆ মক্কা বিজয় (রমাদান, ৮ম হিজরি) ২৭৬
• মক্কার পথে ২৭৯
• নবিজি ﷺ-এর কাছে আবূ সুফ্ইয়ান ২৮১
• নবি ﷺ-এর মক্কায় প্রবেশ ২৮২
• কা'বা পবিত্রকরণ ও সালাত আদায় ২৮৬
• শত্রুদের পরিণাম ২৮৬
• আনুগত্য স্বীকার ২৮৭
• দাগি আসামীদের মৃত্যুদণ্ড ২৮৮
• বিজয়-সালাত ২৮৮
• কা'বার ছাদে বিলালের আযান ২৮৯
• আনসারদের আশঙ্কা ২৮৯
• উযযা, সুওয়া' ও মানাত—মূর্তি ধ্বংস ২৮৯
• বানূ জাযীমার কাছে খালিদ ২৯০
◆ হুনাইনের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৮ম হিজরি) ২৯১
• পলাতক শত্রুদল ২৯৫
◆ তায়িফের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৮ম হিজরি) ২৯৫
• গনীমাতপ্রাপ্ত সম্পদ ও বন্দিদের বণ্টন ২৯৬
• আনসারদের অভিযোগ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্বোধন ২৯৮
• হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের আগমন (যুল-কা'দা, ৮ম হিজরি) ... ২৯৯
• জি'ইর্‌রনার উমরা ৩০০
• বানূ তামীমের ইসলাম গ্রহণ (মুহাররম, ৯ম হিজরি) ৩০০
• বানূ তাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান ৩০১
◆ তাবূকের যুদ্ধ (রজব, ৯ম হিজরি) ৩০৩
• রোমানদের মুখোমুখি হতে মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি ৩০৩

• মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাবূকের পথে ৩০৫
• তাবূকে বিশটি দিন ৩০৭
• উকাইদিরের বন্দিত্ব ৩০৭
• ফের মদীনায় ফেরা ৩০৮
• মুনাফিকদের মাসজিদ ধ্বংস ৩০৮
• নবিজি ﷺ-কে মদীনায় বরণ ৩০৯
• তাবূক যুদ্ধে যায়নি যারা ৩১০
• আবিসিনিয়ার বাদশা ও নবি-তনয়া উম্মু কুলসূমের মৃত্যু ৩১১

■ যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব ৩১২

পঞ্চম অধ্যায়:
ফরজ হাজ্জের বিধান (৯ম হিজরি) বিদায় হাজ্জ (১০ম হিজরি)

■ প্রতিনিধিদের বছর ৩১৪
◆ আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩১৫
◆ দিমাম ইবনু সা'লাবার আগমন ও জিজ্ঞাসাবাদ ৩১৭
◆ আযরা এবং বালি গোত্রদ্বয়ের প্রতিনিধিদল ৩১৯
◆ বানূ আসাদ ইবনি খুযাইমা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩২০
◆ তুজীব গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩২০
◆ বানূ ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩২১
◆ নাজরানবাসীর প্রতিনিধিদল ৩২২
◆ তায়িফবাসীদের প্রতিনিধিদল ৩২৪
◆ বানূ আমির ইবনি সা'সাআ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩২৫
◆ বানূ হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩২৭
◆ হিমইয়ারের রাজাদের প্রতিনিধি ৩২৮
◆ হামদানের প্রতিনিধিদল ৩২৯
◆ বানূ আবদিল মাদান গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩৩০

◆ বানূ মাযহিজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ৩৩১
◆ আযদি শানূআ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৩৩১
◆ জারীর ইবনু আবদিল্লাহ-এর আগমন ও যুল-খালাসা ধ্বংস ৩৩১
◆ আসওয়াদ আন্‌সির উত্থান ও পতন ৩৩২
■ হাজ্জাতুল ওয়াদা'—বিদায় হাজ্জ (১০ম হিজরি) ৩৩৩
◆ উসামা ইবনু যাইদ ﵁-এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন অভিযান ৩৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুউচ্চ বন্ধুর পানে নবি ﷺ-এর যাত্রা

■ অত্যাসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ ৩৪০
■ অসুস্থতার শুরু ৩৪১
■ ওসিয়ত-নসীহত ৩৪২
■ সালাতে আবূ বকরের ইমামতি ৩৪৪
■ নবিজির যা ছিল সব সদাকা ৩৪৪
■ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ দিন ৩৪৫
■ মহানবির মহাপ্রয়াণ ৩৪৬
■ সাহাবিদের হতবিহ্বলতা ৩৪৭
■ আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রত্যয়ী অবস্থান ৩৪৭
■ খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচন ৩৪৯
■ দাফন-কাফন ৩৫০

সপ্তম অধ্যায়: নবিজির পরিবার, গুণ ও আখলাকের বিবরণ

■ নবি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ ৩৫২
১. খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ ৩৫২
২. সাওদা বিনতু যামআ ৩৫২
৩. আয়িশা সিদ্দীকা বিনতু আবী বকর সিদ্দিক ৩৫২
৪. হাফসা বিনতু উমর ইবনিল খাত্তাব ৩৫৩

৫. যাইনাব বিনতু খুযাইমা হিলালিয়্যা ৩৫৩
৬. উম্মু সালামা বিনতু আবী উমাইয়া ৩৫৩
৭. যাইনাব বিনতু জাহশ ৩৫৩
৮. জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস ৩৫৪
৯. উম্মু হাবীবা রামলা বিনতু আবী সুফ্ইয়ান ৩৫৪
১০. সফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব ৩৫৪
১১. মাইমূনা বিনতুল হারিস হিলালিয়্যা ৩৫৫

■ নবিজির সন্তানসন্ততি ৩৫৬

১. কাসিম ৩৫৬
২. যাইনাব ৩৫৬
৩. রুকাইয়া ৩৫৬
৪. উম্মু কুলসূম ৩৫৬
৫. ফাতিমা ৩৫৭
৬. আবদুল্লাহ ৩৫৭
৭. ইবরাহীম ৩৫৭

■ নবিজি ﷺ-এর শারীরিক গঠন, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র ৩৫৭

◆ নবিজির চেহারা ৩৫৮
◆ মাথা, গলা ও চুল-দাড়ি ৩৫৮
◆ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ৩৫৮
◆ গড়ন ও আকৃতি ৩৫৮
◆ নবিজির সুবাস ৩৫৯
◆ চালচলন ৩৫৯
◆ কথা ও কণ্ঠ ৩৫৯
◆ নবি ﷺ-এর আচরণ ও আখলাকের একটুখানি ৩৬০

শেষকথা ৩৬১

লেখকের কথা

নবিজি ﷺ-এর জীবনী অত্যন্ত মহান ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়। নবি ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন এবং ইসলামের উত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় এই সীরাত থেকে। চরম কষ্টের পর আল্লাহ কীভাবে সাফল্য দেন, তা উপলব্ধি করা যায় নবি ও সাহাবিদের জীবনচরিত থেকে।

অন্য যে কারও জীবনীর চেয়ে নবিজীবন অধ্যয়নে শিক্ষা লাভ করা যায় অনেক অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর নবিকে প্রস্তুত করলেন, মানুষের অন্তরে কীভাবে প্রোথিত করলেন তাঁর কিতাবের শিক্ষা, অনেক শক্তিশালী ও বিশাল বিশাল শত্রুদলের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটি দলকে কেমন করে বিজয় দান করলেন, চারদিকে মিথ্যে আর পাপ-পঙ্কিলতার সয়লাবের মাঝে ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যকে কীভাবে সমুন্নত করলেন—এসবের মাঝে নিহিত রয়েছে বহু প্রজ্ঞা।

নবি ﷺ-এর জীবনী পড়ে মুসলিমরা তাদের দ্বীনকে গভীরভাবে বুঝতে শেখে। তাই নবিজির জীবদ্দশা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আলিমগণ নবিজীবন-সংক্রান্ত তথ্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে খুবই সাবধানী। কিন্তু অনেকেই নবিজীবন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এতে মনগড়া, অবান্তর ও অবিশুদ্ধ জিনিস প্রবেশ করিয়েছে। ফলে দিনশেষে দেখা যায়, ইসলামের নবির জীবনীতে অনেক তথ্য স্বয়ং ইসলামের শিক্ষারই বিপরীত।

এসব সমস্যার আলোকে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন বিশুদ্ধ উৎসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি জীবনী লিখতে। এই সুকঠিন কাজটি করতে আমি যেসব উৎসের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলো হলো—কুরআন, বিশুদ্ধ তাফসীর, বিশুদ্ধ হাদীস এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ সীরাহ-গ্রন্থ।

আল্লাহ যেন এই গ্রন্থ থেকে মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং উভয় জাহানে নাজাতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমীন!

সফিউর রহমান মুবারাকপূরি
১২ শাওয়াল, ১৪১৫ হিজরি।

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বেড়ে ওঠা, বংশ-পরিচয় ও নুবুওয়াত লাভের পূর্বের ঘটনাগুলো

মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদিপুরুষগণ

আরব সমাজে বংশধারাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং খুব যত্ন করে তা সংরক্ষণ করা হয়। ফলে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধারা-সংক্রান্ত তথ্যও খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর পরিবার সরাসরি ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর।

নবিজির বংশধর:

আদনানের ছেলে মাআদ, তাঁর ছেলে নিযার, তাঁর ছেলে মুদার, তাঁর ছেলে ইলইয়াস, তাঁর ছেলে মুদরিকা, তাঁর ছেলে খুযাইমা, তাঁর ছেলে কিনানা, তাঁর ছেলে নাদর, তাঁর ছেলে মালিক, তাঁর ছেলে ফিহর, তাঁর ছেলে গালিব, তাঁর ছেলে লুওয়াই, তাঁর ছেলে কা'ব, তাঁর ছেলে মুররাহ, তাঁর ছেলে কিলাব, তাঁর ছেলে কুসাই, তাঁর ছেলে আবদু মানাফ, তাঁর ছেলে হাশিম, তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিব, তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ﷺ।

আদনান যে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ একমত। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যকার প্রজন্মের সংখ্যা এবং তাঁদের নাম নিয়ে বেশ মতপার্থক্য আছে।

নবিজি ﷺ-এর মা আমিনা। তিনি ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনি যুহরা ইবনি কিলাবের মেয়ে। নবি ﷺ-এর পূর্বপুরুষ হিসেবেও কিলাবের নাম পাওয়া যায়। বলা হয় যে, তাঁর আসল নাম ছিল উরওয়া কিংবা হাকীম। জাহিলি যুগে পোষা কুকুর সাথে নিয়ে তিনি প্রায়ই শিকারে বেরোতেন। আরবিতে কুকুরকে বলে 'কিলাব'। উরওয়ার এই শখের কারণে তাঁর এই নামকরণ করা হয়।

নবিজি ﷺ-এর গোত্র

আরবের সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র কুরাইশ। নবি ﷺ এ গোত্রেরই সন্তান। 'কুরাইশ' মূলত ফিহর ইবনু মালিক অথবা নাদর ইবনু কিনানার ডাকনাম ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর বংশধরগণও এ নামেই পরিচিত হন।

আরব উপদ্বীপে কুরাইশ গোত্রের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এ মর্যাদা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গোত্রটির এক সদস্য কুসাই ইবনু কিলাব। তাঁর আসল নাম ছিল যাইদ।

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁকে নিয়ে চলে যান সিরিয়ার নিকটবর্তী আযরা গোত্রে। সে গোত্রেই কুসাইয়ের বেড়ে ওঠা। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো সেখানে অতিবাহিত করে তিনি যৌবনে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। অসাধারণ যোগ্যতার কারণে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর হাতে অর্পিত হয় কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। কুরাইশ গোত্রের তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পান। এই মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তির হাতেই কা'বার চাবি থাকত, তিনি যাকে অনুমতি দিতেন, কেবল সে-ই কা'বায় প্রবেশ করতে পারত এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কা'বার দরজা খোলা হতো না। তাঁরই হাতে হাজ্জযাত্রীদের আতিথেয়তা করার প্রথা আরম্ভ হয়। তিনি হাজিদের জন্য মধু, খেজুর ও কিশমিশ দিয়ে বিপুল পরিমাণ মিষ্টি শরবত তৈরি করে তাদের সামনে পেশ করতেন।

কা'বার উত্তর দিকে একটি ঘরও তৈরি করেন কুসাই। তিনি এর নাম রাখেন দারুন নাদওয়া। বৈঠকভবন। গোত্রীয় বিচার-সালিশ, বিয়ে-শাদি ইত্যাদির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সভা-সমাবেশগুলো দারুন নাদওয়ার প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হতো।

কুরাইশের পতাকা ও ধনুক বহনের দায়িত্বও ছিল কুসাইয়ের কাঁধে। তিনি ছাড়া যুদ্ধের পতাকা উড়ানোর সামর্থ্য কারও ছিল না। দরদি ও জ্ঞানী এই নেতাকে নির্দ্বিধায় মেনে চলত কুরাইশ গোত্র। তাঁরই নেতৃত্বাধীনে মক্কায় স্থায়ী হয় গোত্রটি। ছড়ানো-ছিটানো দল থেকে তারা পরিণত হয় স্থিতিশীল শক্তিশালী এক সমাজে।

বংশধারা

রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিমের নামানুসারে এ বংশকে বলা হয় হাশিমি। কুসাইয়ের দায়িত্বসমূহ থেকে হাজীগণের আতিথেয়তার দায়িত্ব পান হাশিম। এরপর তাঁর কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয় তাঁর ভাই মুত্তালিবের কাছে। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর হাশিমের বংশধররা পুনরায় এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব হাতে পান। ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত তাঁরা এ পদে আসীন থাকেন।

হাশিমকে ওইসময়ের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি বলে গণ্য করা হতো। তিনি 'ওয়াদিয়ে বাতহা'র সর্দার ছিলেন। হাশিম শব্দের অর্থ চূর্ণকারী, টুকরোকারী। তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে গোশত আর ঝোলের সাথে মিশিয়ে একধরনের খাবার তৈরি করে মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। এ কারণেই তাঁর নাম হাশিম বলে পরিচিতি পায়। তাঁর মূল নাম ছিল আমর।

কুরাইশ গোত্র পেশায় ব্যবসায়ী। কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার জন্য শীতকালে ইয়েমেনে আর গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা করেন হাশিম। তিনি এই দুই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কুরাইশ কাফেলার নিরাপদ যাতায়াতের অনুমতিপত্র নিয়ে দেন।[১] সূরা কুরাইশে আল্লাহ তাআলা কুরাইশ গোত্রকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই নিরাপদ ভ্রমণের জন্য তারা আল্লাহর কাছে ঋণী। এটি আল্লাহর অনেক বড় রহমত ও নিয়ামাত।

হাশিম একবার সিরিয়া অভিমুখে ভ্রমণকালে ইয়াসরিবে[২] যাত্রা-বিরতি করেন। সে সময় তিনি সেখানকার বানূ আদি ইবনি নাজ্জার গোত্রের মেয়ে সালামা বিনতু আমরকে বিয়ে করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি আবার সিরিয়া অভিমুখে রওনা হন। অতঃপর ফিলিস্তিনের বিখ্যাত নগরী গাযায় আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সেসময় তাঁর স্ত্রী সালমা গর্ভবতী ছিলেন। তিনি এক ছেলের জন্ম দেন, যার চুলে সাদাটে ভাব ছিল। ফলে তার নাম রাখা হয় শাইবা, যার অর্থ শুভ্রকেশী। সে মদীনায় লালিত-পালিত হতে থাকে। মক্কায় হাশিমের আত্মীয়দের কেউ তখনো শাইবার জন্মের কথা জানত না। আট বছর পর মুত্তালিব জানতে পারেন তাঁর প্রয়াত ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারে। সিদ্ধান্ত নেন তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার। পরে যখন তিনি তাকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন লোকজন ভাবে তাঁর সাথে থাকা ছেলেটা বুঝি তাঁর দাস। ফলে ছেলেটিকে তারা 'আবদুল মুত্তালিব' (মুত্তালিবের দাস) বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। আর এভাবেই শাইবা পরিচিত হয়ে যান আবদুল মুত্তালিব নামে।[৩]

সুদর্শন যুবক হয়ে বেড়ে ওঠা আবদুল মুত্তালিব একসময় কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। ওইসময়ে তাঁর সমমর্যাদার কেউ ছিল না। তিনি কুরাইশদের গোত্রপতি ছিলেন এবং তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর তদারকি করতেন। দানশীলতার কারণে তাঁর খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। অধিক পরিমাণে দান করার কারণে তাকে فَيَّاضٌ 'ফায়্যাদ' (অত্যধিক উদার) বলে অভিহিত করা হতো। অভাবী মানুষ, এমনকি পশুপাখিকেও তিনি খাবার-দাবার দিতেন। তাঁকে বলা হতো 'পাহাড়চূড়ার পশু-পাখিদের এবং ভূপৃষ্ঠের মানুষদের আপ্যায়নকারী'।

পবিত্র যামযাম কূপ পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্বও আবদুল মুত্তালিবের। অনেক অনেক বছর

---

[১] ভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের এই অনুমোদন অনেকটা বর্তমান যুগের ভিসার মতো। তাই এটি আদায় করতে পারা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। (অনুবাদক)

[২] পরে এ অঞ্চলের নাম হয় মদীনা মুনাওওয়ারা।

[৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৩৭-১৩৮; তাবারী, আত-তারীখ, ২/২৪৭।

আগে এখানে নির্জন মরুতে একাকী হন্যে হয়ে পানি খুঁজছিলেন মা হাজার (আলাইহাস সাল্লাম)। আল্লাহর কুদরতে তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পায়ের আঘাতে সে-সময় প্রবাহিত হয় এই কূপ। জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় এই কূপের স্থানটি ঢেকে দিয়ে যায়। তখন থেকেই তা সবার দৃষ্টির আড়ালে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। একরাতে আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে সে স্থানটি দেখানো হয় এবং তা খনন করতে আদেশ দেওয়া হয়। পরদিন তিনি নির্ধারিত স্থানে গিয়ে খনন করতেই পুরোনো সেই যামযামের ধারা আবারও বেরিয়ে আসে।[৪]

আবদুল মুত্তালিবের জীবদ্দশাতেই আবিসিনিয়ান শাসক আবরাহার হস্তিবাহিনী কা'বা আক্রমণ করে। এই বাহিনীকে কুরআনে বলা হয়েছে—"আসহাবিল ফীল" (হাতিওয়ালা)। আবরাহা ষাট হাজার যোদ্ধার এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে রওনা হয়েছিল কা'বা ধ্বংস করার নোংরা মানসিকতা নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল হাজ্জযাত্রীদের ইয়েমেনের নবনির্মিত গির্জা অভিমুখে তীর্থযাত্রায় বাধ্য করা।

মুযদালিফা ও মিনার মাঝে রয়েছে মুহাসসির উপত্যকা। সেখানে এসে জড়ো হয় আবরাহার সেনাদল। যে হাতির পিঠে আবরাহা সওয়ার হয়েছিল, তা সকল মক্কাবাসীকে ভয়ে প্রকম্পিত করে ফেলেছিল। অথচ সেই ভয়ানক জন্তুই কিনা এবার আর অগ্রসর হতে সম্মতি দেয় না। পবিত্র এই গৃহের প্রতিরক্ষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ষাট হাজার হানাদার সেনাকে পাখিগুলো ছোট ছোট পাথর দিয়ে আক্রমণ করে। এরই আঘাতে বিশাল এই বাহিনী চর্বিত ঘাসের মতো (كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ) নেতিয়ে পড়ে।[৫]

এই ঘটনা ঘটেছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৃথিবীতে আগমনের ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে।

নবি ﷺ-এর পিতা আবদুল্লাহ। আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে সুদর্শন, পুণ্যবান ও আদরের সন্তান। তাকে 'যাবীহ'ও বলা হয়। অর্থ—যাকে যবাই বা কুরবানি করা হয়েছে। যামযাম কূপ খননের সময় যখন কূপের নিশান দেখা গেল তখন কুরাইশও আবদুল মুত্তালিবের সাথে এই মর্যাদায় ভাগ বসাতে উদ্যত হলো। এ নিয়ে তাদের মাঝে তুমুল ঝগড়া ও বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরে অতি কষ্টে এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলার একটা মীমাংসা হয়। তবে তাদের বাহাদুরি দেখে আবদুল মুত্তালিব মান্নত করেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে দশটি ছেলে দান করেন এবং প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষের

[৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৪২-১৭৪।

[৫] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/৪৫৮-৪৬৬; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪৩-৬৫।

সাথে লড়াই করার উপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর রাস্তায় যবাই করবেন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করেন। তাঁর দশটি পুত্রসন্তানের সবাই এখন শক্তিশালী লড়াকু সৈনিক। ফলে আবদুল মুত্তালিব মান্নত পুরা করার উদ্দেশ্যে তার সব ছেলের নাম দিয়ে লটারির আয়োজন করেন। লটারিতে আবদুল্লাহর নাম আসে। তাই আবদুল্লাহকে যবাই করার জন্য কা'বা চত্বরে নিয়ে যান। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, বিশেষত আবদুল্লাহর ভাই ও মামারা প্রচণ্ডভাবে এ কাজের বিরোধিতা করেন। অবশেষে ঠিক হয় যে, আবদুল্লাহর বদলে এক শ উট যবাই করা হবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর পরিবর্তে এক শ উট যবাই করেন।

আর এ ঘটনার ফলে আবদুল্লাহর এক নাম হয় 'যাবীহ'।[৬]

এ জন্যই নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'দুই যাবীহের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এক যাবীহ হলেন ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) আর একজন নবিজির সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ।

এমনিভাবে নবি ﷺ-কে আরও বলা হয় 'মুক্তিপ্রাপ্ত দুই নেকব্যক্তির সন্তান'। কারণ, ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও আবদুল্লাহ দু'জনের কুরবানিই কিছু মুক্তিপণের মাধ্যমে রহিত করা হয়। ইসমাঈলের পরিবর্তে কুরবানি হয় একটি দুম্বা এবং আবদুল্লাহর পরিবর্তে এক শ উট।

পিতার মতো আবদুল্লাহও ছিলেন সুন্দর ও সুপুরুষ। বানূ যাহরা গোত্রের নেতা ওয়াহাবের মেয়ে আমিনার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আমিনা সেই সময়ের সবচেয়ে পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। তাদের বংশও ছিল উঁচু। বিয়ের কিছুকাল পরে আমিনা অন্তঃসত্ত্বা হন। কিন্তু সন্তান জন্মের আগেই আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে ব্যবসায়িক কাজে মদীনা বা সিরিয়ায় পাঠান। ফিরতি পথে মদীনায় তাঁর মৃত্যুর বেদনাবিধুর ঘটনা ঘটে। 'নাবিগা যুবইয়ানি' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তখনো নবি ﷺ-এর জন্ম হয়নি।[৭]

---

[৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫১-১৫৫; তাবারি, তারীখ, ২/২৩৯-২৪৩।

[৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫৬-১৫৭; তাবারি, আত-তারীখ, ২/২৪৬; আবুল কাসিম সুহাইলি, আর-রওদুল উনুফ, ১/১৮৪।

জন্ম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর

আবরাহার ব্যর্থ অভিযানের পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন দিন পরের ঘটনা। সময়টা ছিল বসন্তকাল। ৯ রবীউল আউয়াল[৮] সোমবার ভোরবেলায় মক্কা নগরীতে বানূ হাশিম পরিবারে জন্ম হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর। সে বছরই আবরাহা মক্কায় আক্রমণ করেছিল। আরবিতে হাতিকে বলে ফীল। হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ঘটনার কারণে বছরটি পরিচিত হয় আমুল ফীল (عَامُ الْفِيْلِ) বা হস্তিবছর নামে। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নবিজি ﷺ-এর জন্ম-তারিখ পড়ে ২২ এপ্রিল, ৫৭১ সন।

নবি ﷺ-এর জন্মের সময় ধাত্রীর কাজ আঞ্জাম দেন আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা শিফা বিনতু আমর।

সন্তান জন্মদানের পর রাসূল ﷺ-এর মা আমিনা স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর শরীর থেকে একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত করে ফেলছে।[৯]

নাতি জন্মের খবর পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হন আবদুল মুত্তালিব। নবজাতককে কা'বায় নিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। আবদুল মুত্তালিবের ধারণা—তাঁর নাতি একদিন অনেক বড় হবে, খুবই প্রশংসিত হবে। তাই তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ, অর্থ "প্রশংসিত"। আরবের সংস্কৃতি অনুযায়ী সপ্তম দিনে তিনি শিশু মুহাম্মাদের আকীকা করেন, চুল মুণ্ডন করেন এবং খতনা করেন। এরপর মক্কাবাসীদের নিমন্ত্রণ করে বেশ জমজমাট এক ভোজের আয়োজন করেন।[১০]

মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর বাবার দাসী উম্মু আইমান দেখা-শোনা করতেন। তিনি আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তার আসল নাম ছিল বারাকাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক নিয়ামাত ও অনুগ্রহ দান করেছেন। উম্মু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন এবং মদীনায় হিজরতও করেছিলেন।

---

[৮] ৯ রবিউল আউয়ালই যে নবি ﷺ-এর জন্মতারিখ তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তাহ্‌কীক করেছেন মাহমূদ পাশা ফালাকি। দেখুন, নাতাইজুল আফহাম ফী তাকবীমিল আরব কবলাল ইসলাম, ২৮-৩৫।
তবে ১২ রবিউল আউয়াল-এর কথাও কেউ কেউ বলেন।

[৯] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১২৭, ১২৮; ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১০২।

[১০] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫৯-১৬০; তাবারি, আত-তারীখ, ২/১৫৬-১৫৭।
বলা হয়, নবি ﷺ খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। -ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৪।
কিন্তু ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এ ব্যাপারে কোনো হাদীস প্রমাণিত নেই।'-যাদুল মাআদ, ১/১৮।

নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তিনিও মদীনাতে ইন্তিকাল করেন।[১১]

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধপান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মা আমিনার দুধ পান করানোর সাথে সাথে চাচা আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবাও তাঁকে দুধ পান করান। সে সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে তার সন্তান মাসরূহও দুধ পান করছিল। এর আগে হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং আবূ সালামাকেও সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। ফলে তারা তিন জন মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধভাই হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১২]

হালীমা সা'দিয়ার কোলে নবিজি

আরবদের একটি প্রথা ছিল শহরের খারাবি থেকে বাঁচানোর জন্য শিশুসন্তানকে দুধ পান করাতে বেদুইন নারীদের তত্ত্বাবধানে রাখা। তারা সন্তানকে শক্তিশালী ও সুঠাম করে গড়ে তোলার জন্য মরুভূমির প্রাকৃতিক ও রুক্ষ পরিবেশে পাঠিয়ে দিত। তা ছাড়া সারা আরবে বেদুইনদের ভাষাটাই ছিল আরবির বিশুদ্ধতম রূপ। ফলে তাদের সাথে বেড়ে উঠলে শিশুরা সহজেই প্রমিত আরবি ভাষা শিখতে পারত। আর শহরে বিভিন্ন মানুষের বসবাসের কারণে ভাষাও মিশ্র হয়ে যায়, তাই বিশুদ্ধ রূপ আর থাকে না।

আবদুল মুত্তালিব তাই নাতির জন্য এ রকম কোনও বেদুইন ধাত্রীর সন্ধানে ছিলেন। বানূ সা'দ ইবনু বকর ইবনি হাওয়াযিন গোত্রের নারীদের একটি দল সে-সময় মক্কায় আসে শিশুর খোঁজে। আবদুল মুত্তালিব তাদের প্রত্যেককেই শিশু মুহাম্মাদকে নিতে বলেন। কিন্তু তাঁর পিতা নেই শুনে কেউ নিতে চায় না। বাপমরা শিশুর পরিবারের কাছ থেকে সাধারণত ভালো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না—এই ভাবনায় সবাই প্রত্যাখ্যান করতে থাকে।

ওদিকে পিছিয়ে পড়া হালীমা বিনতু আবী যুওয়াইব যখন শহরে এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে অন্য নারীরা কোনো-না-কোনো শিশুর দায়িত্ব পেয়ে গেছে। তার ভাগে ভালো কোনও শিশু মিলেনি। একরকম বাধ্য হয়েই তিনি আবদুল মুত্তালিবের কোলে থাকা শিশুটিকে নিয়ে নেন। কিন্তু তাঁকে কোলে তুলে নেওয়ার পরক্ষণেই তার এমন সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়, যা দেখে পৃথিবীবাসী অবাক বিস্ময়ে নির্বাক তাকিয়ে রয়। যার এক ঝলক আপনারা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রত্যক্ষ করবেন, ইন শা আল্লাহ।

[১১] মুসলিম, ১৭৭১।

[১২] বুখারি, ৫১০০, ৫১০১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/১৫৭; তাবারি, আত-তারীখ, ২/১৫৮।

হালীমা সা'দিয়ার পিতা আবূ যুওয়াইবের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস। তিনি নবি ﷺ-এর দুধনানা। হালীমার স্বামীর নাম হারিস ইবনু আবদিল উযযা। তারা উভয়েই সা'দ ইবনু বকর ইবনি হাওইয়াযিন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের সন্তানেরা নবিজি ﷺ-এর দুধভাইবোন। তাঁদের তিন জন সন্তান—আবদুল্লাহ, আনিসা এবং জুযামা। জুযামার আরেক নাম শায়মা। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বয়সে বড় ছিলেন। তিনিও শিশু মুহাম্মাদের দেখাশোনা করতেন, খাওয়াতেন এবং আদর করতেন।

হালীমার ঘরে বরকতের বারিধারা

মুহাম্মাদ ﷺ-কে কোলে তোলার পর থেকেই হারিস-হালীমা দম্পতির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। অনাবিল ঐশ্বর্যে অবগাহন করে পুরো পরিবার। মুহাম্মাদ ﷺ যতদিন হালীমার পরিবারে ছিলেন, ততদিন তাঁদের ঘর প্রাচুর্যে ভাসতে থাকে। হালীমা নিজেই বলেছেন যে, যখন তিনি মক্কায় আসেন তখন ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। তাদের একটি গাধি ছিল—এ-রকম দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, পুরো কাফেলার মধ্যে সবচেয়ে কমজোর ও ধীর গতির ছিল। সবাই তার সামনে, কেউ পেছনে ছিল না। একটি উটনীও ছিল কিন্তু একফোঁটাও দুধ দিত না। হালীমা নিজেও অভুক্ত, বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। সন্তানেরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করত এবং কাঁদতে থাকত। তারা নিজেরাও ঘুমাত না, বাবা-মাকেও ঘুমাতে দিত না।

কিন্তু তারা যখন মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঘরে নিয়ে আসল এবং হালীমা তাঁকে কোলে তুলে নিল তখন তার সীনা দুধে ভরপুর হয়ে গেল। ফলে মুহাম্মাদ ﷺ ও তার বাচ্চারা তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে তার স্বামী হারিস উঠে গিয়ে দেখেন যে, উটনীর ওলানও দুধে টইটম্বুর। তারা সে রাতে সব পাত্র ভর্তি করে দুধ দোহন করল এবং পুরো পরিবার পেট পুরে খেয়ে খুব প্রশান্তির সাথে রাত কাটাল।

মক্কা থেকে ফেরার সময় হালীমা তার ওই গাধির ওপরই সওয়ার হয়েছিল কিন্তু এবার সাথে ছিল মুহাম্মাদ ﷺ। ফলে সেই গাধিই এত দ্রুত চলা আরম্ভ করল যে, পুরা কাফেলাকে পেছনে রেখে সবার সামনে চলে গেল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলার মতো কেউ ছিল না।

কোনও এক অদৃশ্য ইশারায় হালীমার ঘরকে দুর্ভিক্ষ ও খরা আর স্পর্শ করে না। অথচ তাঁদের বাসস্থান বানূ সা'দ ছিল ওই এলাকার সবচেয়ে দুর্ভিক্ষময় ও খরাপ্রবণ জায়গা। তাঁদের ছাগলগুলো চারণভূমি থেকে পেট ভরে খেয়ে ফেরত আসে, ওলান থাকত দুধে ভরা। একসময় যেখানে একফোঁটা দুধও পাওয়া যেত না, সেখানে আজ দুধ দোহন

করেই কূল পাওয়া যায় না। খরার মাঝেও তাই শিশু মুহাম্মাদ বেড়ে ওঠেন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়ে। এভাবে সুখের এই সময়গুলো অতিবাহিত হতে থাকে। দু-বছর পরে দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ হলে হালীমা নবি ﷺ-কে দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দেন।

শিশু মুহাম্মাদকে বুকে রাখতে হালীমার ব্যাকুলতা

ছয় মাস পরপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে মক্কায় তাঁর মা ও পরিবারের সাথে দেখা করাতে নিতেন হালীমা। দু-বছর পর যখন দুধ ছাড়ানো হয়, তখন সারা জীবনের তরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পরিবারের কাছে দিয়ে আসার সময় আসে। হালীমা এবার শিশুকে মায়ের কাছে নেওয়ার পর ব্যাকুল হয়ে খুব করে অনুরোধ করলেন, যেন আরও কিছুকাল তাকে রাখতে দেয়। কারণ, যে কল্যাণ ও নিয়ামাতের ছোঁয়া তারা পেয়েছিল তা অবর্ণনীয়। তিনি নবি ﷺ-এর মাকে বলেন যে, মরুভূমিতে সে শক্ত-সামর্থবান-সুঠাম হয়ে বেড়ে উঠবে। এমনিতেও মক্কায় অহরহ মহামারি লেগেই থাকে। তা থেকেও দূরে থাকতে পারবে। আমিনার সম্মতিতে খুশিমনে শিশুকে নিয়ে ফিরে আসেন হালীমা।[১৩]

আরও বছর দুই পর এক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যা দেখে হারিস-হালীমা দম্পতি খুব ভয় পেয়ে যান। ফলে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের অতি প্রিয় মুহাম্মাদকে মক্কায় মায়ের কাছে রেখে আসেন।[১৪]

বক্ষবিদারণ: অলৌকিক ঘটনা

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু)। হালীমার ঘরের কাছেই একদিন মুহাম্মাদ ﷺ অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে তাঁকে শোয়ান। তারপর বালক মুহাম্মাদের বুক চিরে তাঁর হৃদপিণ্ড বের করে আনেন। সেখান থেকে একটি টুকরো ফেলে দিয়ে বলেন, "আপনার মাঝে ওটা ছিল শয়তানের অংশ।" এরপর তিনি হৃৎপিণ্ডটি যামযামের পানিতে পূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্রে রেখে ধৌত করেন। তারপর পরিচ্ছন্ন সেই অন্তর পুনঃস্থাপিত করেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বক্ষে।

তখন অন্য বাচ্চারা আতঙ্কে কান্না করতে করতে দৌড়ে যায় হালীমার কাছে। গিয়ে বলে, মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলেছে। হারিস-হালীমা দম্পতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে

[১৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬২-১৬৪; ইবনু হিব্বান, আস-সীরাহ, ৮/৮২-৮৪।

[১৪] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১১২; মাসউদি, মুরূজুয যাহাব, ১/১৮১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/১৬১-১৬২। অনেকে ইবনু আব্বাসের কথা অনুসারে এই ঘটনা ৫ম বছরে ঘটেছে বলে মত পেশ করেছেন।

বালক মুহাম্মাদকে জীবিত দেখতে পান। কিন্তু তাঁর চেহারা ভয়ে একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর বুক ফাড়া সেলাইয়ের দাগটা তিনি দেখেছেন।[১৫]

মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন

এই অতি-অলৌকিক ঘটনার পর নবি ﷺ-কে তারা মক্কায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। পরের দু-বছর সেখানে তিনি মায়ের আদর, ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন ছয়, তখন তাঁকে সাথে করে নানাবাড়ি মদীনার উদ্দেশে রওনা দেন আবদুল মুত্তালিব, আমিনা ও উম্মু আইমান। নবিজি ﷺ-এর বাবার কবরও সেখানেই। মদীনায় এক মাস কাটানোর পর মক্কা-অভিমুখে ফিরতিপথের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পথে আমিনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একসময় অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ধূলির এই ধরা থেকে বিদায় নেন। শিশু মুহাম্মাদ মা'কে হারিয়ে এখন ইয়াতীম। অসহায়। বাবা-মা দু'জনেরই ছায়াশূন্য। আমিনাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।[১৬]

পিতামহের স্নেহ-ছায়ায়

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব মা-বাবা হারা নাতিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। নতুন এই বিপদের কারণে তাঁর হৃদয়ে এমন এক মমতার উদ্রেক হয়, যা তিনি আপন সন্তানদের প্রতিও কখনও কোনোদিন অনুভব করেননি। তিনি নবি ﷺ-কে অনেক আদর করতেন এবং মর্যাদা দিতেন। শুধু তাঁর জন্য নির্মিত বিছানাতেও নবিজিকে বসাতেন, যেখানে অন্য কারও বসার অনুমতি ছিল না। অন্যান্য লোকজনের সাথে বসলেও তিনি পাশে একটি মাদুরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বসাতেন। তাঁর পিঠ চাপড়ে দিতেন, প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উঠা-বসা, চাল-চলন-আচরণ প্রতিটি বিষয়ই তাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করত এবং আনন্দ দিত।

তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর নাতি অনেক বড় হবে। সবার মাঝে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। নবিজির বয়স যখন মাত্র আট বছর দুই মাস দশ দিন, তখন আবদুল মুত্তালিব

---

[১৫] মুসলিম, ১৬২।

[১৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬৮; ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৭।

মৃত্যুবরণ করলেন।[১৭]

চাচার মমতাময় প্রতিপালন

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবূ তালিব দায়িত্ব নেন মুহাম্মাদ ﷺএর প্রতিপালনের। তিনি নবিজির আপন চাচা। তিনিও নবিজিকে অনেক আদর ও স্নেহ করতেন। আবূ তালিব ধনী ও সচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তার অল্প সম্পদেও এমন বরকত হতে আরম্ভ করে যে, একজনের খাবারই পুরা পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আর নবিজি ﷺ নিজেও ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, যা জুটত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

সিরিয়া সফর ও পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন বারো বছর (কিছু তথ্যসূত্র অনুযায়ী, বারো বছর দুই মাস দশ দিন),[১৮] তখন আবূ তালিব সিরিয়ায় একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু না তিনি চাইছিলেন ভাতিজাকে রেখে যেতে, আর না মুহাম্মাদ ﷺ চাইছিলেন চাচার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। শেষমেশ তাঁকে সাথে নিয়ে চলেন আবূ তালিব।

সিরিয়ার সীমান্তে বুসরার নিকটে পৌঁছে কাফেলা যাত্রাবিরতি করে। কাফেলাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন সে শহরে থাকা বড় এক খ্রিষ্টান পাদরি। অথচ এর আগে বহু কাফেলা এসেছে গিয়েছে কিন্তু তিনি তাদের নিকট আসেননি এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। তার নাম ছিল বুহাইরা।[১৯] সবাইকে অতিক্রম করে বালক মুহাম্মাদের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বুহাইরা বললেন, "এই বালক হবে পুরা বিশ্বের নেতা এবং মহাপ্রভুর বার্তাবাহক। আল্লাহ তাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন।"

সবাই বলল, "আপনি কীভাবে তা জানতে পারলেন?"

বুহাইরা জবাবে বললেন, "সে এদিকটায় আসামাত্রই দেখলাম সব পাথর আর গাছ তাকে সাজদা করার জন্য ঝুঁকে পড়েছে। গাছ ও পাথর নবিদের ছাড়া আর কাউকেই সাজদা করে না। শুধু তা-ই না। নুবুওয়াতের সিলমোহর দেখেও আমি তাকে চিনেছি।

---

[১৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬৮-১৬৯; ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৭।

[১৮] ইবনুল জাওযি, তালকীহ্, ৭।

[১৯] তবে কেউ কেউ বলেছেন, বাহীরা।

তার কাঁধের নিচের নরম হাড়ের ওপর আছে ওটা, অনেকটা আপেলের মতো দেখতে। আমরা আমাদের কিতাবেও এমনটি পেয়েছি।”

বুহাইরা এরপর সেই কাফেলার সম্মানার্থে একটি ভোজের আয়োজন করেন। পরে একসময় আবূ তালিবকে ডেকে নিয়ে অনুনয় করেন যেন বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে আর সামনে না নেওয়া হয়; বরং বাড়িতেই ফিরিয়ে দিতে বলেন তাঁকে। পাছে ইয়াহূদি বা রোমানরা তাঁকে প্রতিশ্রুত সেই নবি হিসেবে চিনতে পেরে হত্যা করতে আসে—এই ভয়েই তিনি এমন পরামর্শ দেন। পাদরির আশঙ্কা আবূ তালিব উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভাতিজার নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন তিনি।[২০]

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। এর মাঝে দুটি ঘটনা আলাদা মনোযোগের দাবিদার।

ফিজার যুদ্ধ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স তখন বিশ বছর। যুল-কা’দা মাসে যথারীতি চলছে উকায মেলা। কিন্তু সেখানের কোনও এক ঘটনার জের ধরে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ বেধে যায়। এক পক্ষে রয়েছে কুরাইশ ও কিনানা গোত্রদ্বয়, আরেক পক্ষে কায়স ও গায়লান।

অনেক রক্তপাতের পর অবশেষে তারা একটি সমঝোতায় আসতে সমর্থ হয়। যে পক্ষে বেশি হতাহত হয়েছে, সে পক্ষ রক্তপণ (অবৈধ হত্যার বিনিময়ে প্রদেয় আর্থিক জরিমানা) পাবে। উল্লেখ্য, এর আগের তিন বছরেও কিন্তু পরপর তিনটি দাঙ্গা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মারামারি, কাটাকাটি ও রক্তাক্ত হওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ ঝগড়া-বিবাদ ছিল। মোট এই চারবারের লড়াই-ই ফিজার যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। আরবিতে ফিজার অর্থ অনৈতিকতা। যুল-কা’দা মাসের পবিত্রতার কারণে এ-সময় যেকোনও ধরনের রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সেই পবিত্রতা লঙ্ঘন করে যুদ্ধটি বেধেছিল বলেই এই নাম।

কুরাইশের সদস্য হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল শত্রুপক্ষের ছোড়া তির সংগ্রহ করে স্বগোত্রীয় যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়া।[২১]

---

[২০] তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৬২০; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১১৭৮২; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/২৪-২৫; তাবারি, আত-তারীখ, ২/২৭৮-২৭৯।

[২১] ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, ১/৪৬৮-৪৭২; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৮৪-১৮৭; মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব বাগদাদি, আল-মুনাম্মাক ফী আখবারি কুরাইশ, ১৬৪, ১৮৫।

হিলফুল ফুদূল

ফিজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে সেই মাসেই কুরাইশের পাঁচটি বংশের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর নাম হিলফুল ফুদূল। স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো হলো বানূ হাশিম, বানূ আবদিল মুত্তালিব, বানূ আসআদ, বানূ যাহরা এবং বানূ তাইম।

চুক্তিটির আবির্ভাব হয় এক লজ্জাকর ঘটনার প্রতিবাদে। স্রেফ অপরিচিত আর অচেনা হওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা। 'যুবাইদ' (ইয়েমেন) অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। আস ইবনু ওয়াইল নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি তার সকল পণ্য বিনামূল্যে ছিনিয়ে নেয়। অসহায় লোকটি একে একে বানূ আবদিদ দার, বানূ মাখযূম, বানূ জামাহ্, বানূ সাহ্ম ও বানূ আদির কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। একটা মানুষও তার সেই আকুল আবেদনে সাড়া দেয়নি। মরিয়া হয়ে লোকটি জাবালে আবী কুবাইস-এর চূড়ায় উঠে দাঁড়ান। সবার কাছে ঘোষণা করেন নিজের দুঃখের কাহিনি। শ্রোতাদের কাছে সাহায্যের চেয়ে আকুল আবেদন ব্যক্ত করেন। সে আবেদনে সাড়া দেন যুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব। দুর্দশাগ্রস্ত অচেনা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত।

যুবাইর সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের এক জায়গায় জড়ো হওয়ার আহ্বান করেন। বানূ তাইমের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের বাড়িতে সভা বসে। সেখানে গোত্রপতিরা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করেন। এখন থেকে বংশ-গোত্র নির্বিশেষে যেকোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়-অত্যাচার প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর আস ইবনু ওয়াইলকে বাধ্য করা হয় ওই ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য ফিরিয়ে দিতে।

চুক্তির সময় মুহাম্মাদ ﷺ-ও সে সভায় নিজ চাচাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

নুবুওয়াত লাভের পর তিনি ঘোষণা করেন, "আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের ঘরে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনায় আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। এমন এক চুক্তি, যার বিনিময়ে লাল উটও আমার অপছন্দ। ইসলামের যুগেও যদি সে চুক্তির জন্য আমাকে ডাকা হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাতে সাড়া দিতাম।"[২২]

নবিজির কর্মজীবন

মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথমে আপন দাদা পরে চাচার অধীনে লালিত-পালিত হয়েছেন। পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অল্প কিছু সম্পদ

[২২] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১২৬-১২৮; যুবাইরি, নাসাবু কুরাইশ, ২৯১।